Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যুগে যুগে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারীতে মুসলিম মনীষীদের ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাসরিন জাহান সেতু

রোলঃ 227021659

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যুগে যুগে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারীতে মুসলিম মনীষীদের ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাসরিন জাহান সেতু

রোলঃ 227021659

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " যুগে যুগে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারীতে মুসলিম মনীষীদের ভূমিকা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাসরিন জাহান সেতু, আইডিঃ 227021659 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " যুগে যুগে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারীতে মুসলিম মনীষীদের ভূমিকা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সেতু

(স্বাক্ষর)

নাসরিন জাহান সেতু

আইডিঃ 227021659

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা..5

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং এর প্রভাব..6

মহামারীঃ ইতিহাস ও প্রভাব..8

পৃথিবীর বুকে প্রথম মহামারী..10

রাসূলের (ﷺ) যুগে মহামারী..11

সাহাবীদের যুগে মহামারী এবং তাদের গৃহীত পদক্ষেপ..12

তাবেঈদের যুগে মহামারী এবং তাদের অবস্থান..20

ছোঁয়াচে রোগ ও মহামারীতে রাসূল (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল..24

মক্কা-মদীনা ও শামের সাহাবীদের আমল..25

মহামারী বিষয়ে সালাফদের লিখিত গ্রন্থসমূহ..27

মধ্যযুগে মহামারীতে মুসলিম মনীষীদের চিকিৎসাবিদ্যায় ভূমিকা..29

বর্তমান যুগে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারীতে আলেম-ওলামাদের ভূমিকা এবং অবদান।..32

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারী: আমাদের জন্য শিক্ষা..36

শেষকথা..38

ভূমিকা

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির উপর শাস্তি কিংবা পরীক্ষাস্বরূপ নানারূপ মহামারী প্রেরণ করেন। আর এই মহামারী কখনও সৎকর্মশীল বান্দাদের উপরও নেমে আসতে পারে।[১] এতে মুমিনদের জন্য যেমন শিক্ষা রয়েছে, তেমনি আত্মসংশোধনেরও সুযোগ রয়েছে।[২] তাছাড়া এটি মুমিনদের জন্য রহমতও বটে। কারণ এতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে মুমিন শাহাদতের মর্যাদা লাভ করবে।[৩) সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈদের যুগেও বহু মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল, যার অধিকাংশ ছিল সিরিয়া ও ইরাক জুড়ে। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে ইযাম এটিকে তাদের জন্য অভিশাপ মনে করতেন না। বরং তারা মনে করতেন, এটি রাসূলের (ﷺ) দু'আ, যা কাফেরদের আঘাতে মৃত্যু থেকে রক্ষার উপায়।[৪]

যুগে যুগে মুসলিম মনীষীগণ দুর্যোগ ও মহামারীতে মানবজাতির সহায়তায় অসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন এবং নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে গেছেন। মুসলিম মনীষীগণ এইসব সংকট মোকাবিলায় তাদের উদ্ভাবনী শক্তি, ঈমানি চেতনা এবং মানবসেবার মধ্য দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তারা কেবল তাদের সমাজ ও জাতিকে সেবা করেননি, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য আদর্শ হয়ে উঠেছেন। কুরআন ও হাদিসে দুর্যোগ ও মহামারীর সময় মানবসেবার গুরুত্ব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং মানবতার সেবায় কাজ করার ব্যাপারে ব্যাপক উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, যা তাদের এইসব কর্মকাণ্ডে প্রেরণা জুগিয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং এর প্রভাব

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে বোঝায় প্রকৃতির শক্তি বা প্রক্রিয়া দ্বারা সৃষ্ট এমন ঘটনাগুলি, যা মানুষের জীবন, সম্পদ এবং পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিভিন্ন প্রকারভেদে বিভক্ত এবং এগুলোর প্রত্যেকটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব

১. ভূমিকম্প–
বৈশিষ্ট্যঃ ভূগর্ভস্থ টেকটোনিক প্লেটের সঞ্চালনের কারণে সৃষ্টি হয়। তীব্র কম্পন অনুভূত হয় এবং এটি কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিট স্থায়ী হতে পারে।
প্রভাবঃ ভবন ধস, ভূমিধস, সুনামি এবং ব্যাপক প্রাণহানি।

২. ঘূর্ণিঝড়–
বৈশিষ্ট্যঃ উষ্ণ সাগরে সৃষ্ট তীব্র নিম্নচাপের ফলে ঘূর্ণায়মান বায়ুপ্রবাহ তৈরি হয়। ঘণ্টায় বাতাসের গতি ১২০ কিলোমিটার বা তার বেশি হতে পারে।
প্রভাবঃ উপকূলীয় এলাকা প্লাবিত হওয়া, ঘরবাড়ি ধ্বংস, গাছপালা ও ফসলের ক্ষতি।

৩. বন্যা–
বৈশিষ্ট্যঃ ভারী বৃষ্টিপাত, নদীর জলস্তর বৃদ্ধি, বাঁধ ভেঙে যাওয়া ইত্যাদি কারণে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়।
প্রভাবঃ মানুষের স্থানচ্যুতি, কৃষি জমির ক্ষতি এবং পানিবাহিত রোগের বিস্তার।

৪. খরা–
বৈশিষ্ট্যঃ দীর্ঘ সময় ধরে বৃষ্টিপাতের অভাব বা জলসংকটের কারণে ভূমি শুষ্ক হয়ে যায়।
প্রভাবঃ ফসল উৎপাদন কমে যায়, খাদ্যসংকট এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি।

৫. সুনামি–

বৈশিষ্ট্যঃ সমুদ্রতলীয় ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণ বা ভূমিধসের কারণে সৃষ্ট বিশাল সমুদ্রতরঙ্গ।

প্রভাবঃ উপকূলীয় এলাকা সম্পূর্ণ ধ্বংস, প্রচুর প্রাণহানি এবং সম্পদের ক্ষতি।

৬. অগ্ন্যুৎপাত–

বৈশিষ্ট্যঃ আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তর থেকে গলিত লাভা, গ্যাস ও ছাই উদ্গীরণ।

প্রভাবঃ পরিবেশ দূষণ, কৃষি জমির ক্ষতি এবং আশপাশের জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি।

৭. ভূমিধস–

বৈশিষ্ট্যঃ ভূমি ও শিলার স্তর নিচের দিকে ধসে পড়া। ভারী বৃষ্টিপাত বা ভূমিকম্পের ফলে এটি ঘটে।

প্রভাবঃ রাস্তা বন্ধ, বাড়িঘর ধ্বংস এবং প্রাণহানি।

৮. ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাত–

বৈশিষ্ট্যঃ তীব্র বাতাস, ভারী বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের সাথে ঘটে।

প্রভাবঃ ফসলের ক্ষতি, গাছপালা উপড়ে পড়া, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ক্ষতি।

মহামারীঃ ইতিহাস ও প্রভাব

ইতিহাস

মহামারী বা অতিমারি (Pandemic) এমন একটি সংক্রামক রোগ যা বিশ্বজুড়ে বা বড় কোনো অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেক মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। মহামারীর ইতিহাসে অনেক রোগ মানুষ এবং সমাজকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে।

আমাদের প্রজন্মে যদিও বিশ্বব্যাপী মহামারীর (Covid-19) ঘটনা এই প্রথম। তবে সময়ের ইতিহাসে এবং ইসলামের ইতিহাসেও এ পর্যন্ত বেশ অনেকগুলো মহামারী অতিবাহিত হয়েছে। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং ভয়াবহ আকারে যে কয়টি মহামারী ছড়িয়ে পড়েছিলো, সেগুলো নিম্নরূপঃ

১- ১৮ হিজরি মোতাবেক ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ছড়িয়ে পড়া আমওয়াস মহামারী।
২- ৬৯ হিজরি মোতাবেক ৬৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ছড়িয়ে পড়া জারিফ মহামারী।
৩- ৮৭ হিজরি মোতাবেক ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে ছড়িয়ে পড়া ফাতায়াত মহামারী। এই মহামারীতে অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মৃত্যু হওয়ায় এটিকে তাউনে আশরাফ তথা সম্ভ্রান্তদের মহামারীও বলা হয়।
৪- ১৩১ হিজরি মোতাবেক ৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ছড়িয়ে পড়া তাউনু মুসলিম ইবনু কুতাইবা।
৫- এছাড়া আব্বাসীয়, মামলুক এবং আইয়ুবী শাসনামলে ইসলামি প্রাচ্যে আরো কিছু মহামারী ছড়িয়ে পড়েছিল।

ইতিহাসে আরো কিছু মহামারীঃ

১. অ্যাথেন্সের প্লেগ (৪৩০ খ্রিষ্টপূর্ব): প্রাচীন গ্রিসে পেলেরোপনেশিয়ান যুদ্ধের সময় ছড়িয়ে পড়ে। এ রোগের কারণ অজানা, এতে অনেক মানুষ মারা যায়।

২. জাস্টিনিয়ানের প্লেগ (৫৪১-৫৪২ খ্রিষ্টাব্দ): বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে ইয়েরসিনিয়া পেস্টিস ব্যাকটেরিয়ার কারণে হয়। এটি ইউরোপ, এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

৩. স্প্যানিশ ফ্লু (১৯১৮-১৯১৯): ৫০ কোটিরও বেশি মানুষকে সংক্রমিত করেছিল এবং প্রায় ৫ কোটির মতো মানুষ মারা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বের সমাজ ও অর্থনীতিতে এটি বড় প্রভাব ফেলেছিল।

প্রভাব

১. স্বাস্থ্য সংকটঃ মহামারী সরাসরি মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর আঘাত হানে। যেমন, কোভিড-১৯ মহামারীতে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও অনেকে দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন।

২. অর্থনীতিঃ লকডাউন, বাণিজ্য স্থগিত, কর্মসংস্থান হ্রাস এবং উৎপাদন ব্যবস্থার ধ্বংস মহামারীর সাধারণ অর্থনৈতিক প্রভাব।

৩. সামাজিক পরিবর্তনঃ মহামারী মানুষের জীবনযাত্রা ও আচরণে পরিবর্তন আনে।

৪. মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবঃ মহামারী ভীতি, দুঃখ ও বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়।

৫. সামাজিক অসমতাঃ দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির মানুষ মহামারীর সময় আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চিকিৎসা সেবা, খাবার এবং অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণে তারা পিছিয়ে পড়ে।

পৃথিবীর বুকে প্রথম মহামারী

পৃথিবীতে প্রথম মহামারী এসেছিল ইহুদীদের উপর, যখন তারা যুলুম করছিল।[৫] রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ত্বা‘ঊন বা মহামারী হল এক রকমের আযাব। এই ত্বা‘ঊন বানী ইসরাঈলের একটি দলের ওপর নিপতিত হয়েছিল। অথবা তোমাদের আগে যারা ছিল তাদের উপর নিপতিত হয়েছিল। তাই তোমরা কোন জায়গায় ত্বা‘ঊন-এর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে শুনলে সেখানে যাবে না। আবার তোমরা যেখানে থাক সেখানে মহামারী শুরু হয়ে গেলে সেখান থেকে পালিয়ে বের হয়ে যেও না।[৬] ত্বীবী বলেন, তারা হচ্ছে ঐসব লোক যাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা আদেশ করেছিলেন দরজার ভিতরে প্রবেশের সময় সিজদাবনত হতে। কিন্তু তারা তার বিরোধিতা করেছিল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ

"অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যারা যুলম করেছিল, তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে তারা অন্য কথা বলল। ফলে আমি আসমান থেকে তাদের উপর শাস্তি পাঠালাম, কারণ তারা যুলম করত।"
–(সূরা আল-আ'রাফ: ১৬২)

ইবনু মালিক বলেন, তাদের ওপর মহামারীকে আযাব হিসাবে আল্লাহ পাঠিয়েছেন। ফলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে চব্বিশ হাজার শীর্ষস্থানীয় ইহুদী মারা যায়।[৭]

রাসূলের (ﷺ) যুগে মহামারী

রাসূলের (ﷺ) আমলে মক্কা ও মদীনায় কোন মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেনি। রাসূলের (ﷺ) হিজরত পূর্বকালে মদীনা ছিল মহামারী প্রবণ এলাকা। তবে রাসূলের (ﷺ) দু'আর বরকতে তা উঠে যায়।

আয়িশা (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মদীনায় শুভাগমন করলে আবু বকর ও বিলাল (রা.) জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আবু বকর (রা.) জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়লে তিনি এ কবিতাংশটি আবৃত্তি করতেন:
"প্রত্যেকেই স্বীয় পরিবারের মাঝে দিনাতিপাত করছে,
অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতা অপেক্ষা সন্নিকটবর্তী।"
আর বিলাল (রা.) জ্বর থেকে সেরে উঠলে উচ্চস্বরে এ কবিতাংশ আবৃত্তি করতেন:
"হায়, আমি যদি কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে মক্কার প্রান্তরে একটি রাত কাটাতে পারতাম
আর আমার চারদিকে থাকত ইযখির এবং জালীল ঘাস।
মাজান্না ঝর্ণার পানি পানের সুযোগ কখনো হবে কি?
আমার জন্য শামা এবং ত্বফীল পাহাড় প্রকাশিত হবে কি?"
আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেনঃ হে আল্লাহ! তুমি শায়বা ইবনু রাবী'আ, 'উতবা ইবনু রাবী'আ এবং উমায়্যাহ ইবনু খালফের প্রতি লা'নত বর্ষণ কর; যেমনিভাবে তারা আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমি হতে বের করে মহামারীর দেশে ঠেলে দিয়েছে। এরপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) দু'আ করলেনঃ হে আল্লাহ! মদিনাকে আমাদের নিকট মক্কার মত বা তার চেয়েও বেশি প্রিয় করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের সা' ও মুদে বরকত দান কর এবং মদীনাকে আমাদের জন্য স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও। এর জ্বরের প্রকোপকে বা মহামারীকে জুহফায় স্থানান্তরিত করে দাও। 'আয়িশা (রা.) বলেন, আমরা যখন মদিনা এসেছিলাম তখন তা ছিল আল্লাহর যমীনে সর্বাপেক্ষা অধিক মহামারীর স্থান। তিনি আরো বলেন, সে সময় মদীনায় বুতহান নামক স্থানে একটি ঝর্ণা ছিল যেখান হতে বর্ণ ও বিকৃত স্বাদের পানি প্রবাহিত হত।' (বুখারী, হাদিস: ১৮৮৯)

রাসূলের (ﷺ) যুগে মক্কা মদীনায় কোন মহামারীর প্রাদুর্ভাব না ঘটলেও ইরানে ৬ষ্ঠ হিজরী তথা ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। ঐতিহাসিক ইবনু আসাকির বলেন, لم يكن طاعون أشد من ثلاثة طواعين طاعون أزدجرد وطاعون عمواس وطاعون الجارف، 'তিনটি মহামারীর চেয়ে ভয়াবহ ও মারাত্মক মহামারী আর ছিল না। সেগুলো হল আযদাজার্দ মহামারী, আমওয়াস মহামারী ও জারেফ মহামারী'।[৮] ইরানের সেই মহামারীতে কত সংখ্যক

মানুষ মারা গিয়েছিল তা জানা যায় না। এটি শীরাওয়াইহ্ মহামারী নামেও পরিচিত যার প্রাদুর্ভাব মাদায়েন শহরে ঘটেছিল।[৯] তবে ঐতিহাসিক আছমাঈ ও আবু আইউব সাখতিয়ানী ১৬ হিজরী সনে ত্বাউনে শেরওয়াইহ বিন কিসরায় প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন। *(আহমাদ আল-'আদাবী, আত-ত্বাউন ফী আছরিল উমাভী)*।

সাহাবীদের যুগে মহামারী এবং তাদের গৃহীত পদক্ষেপ

আমওয়াস মহামারীঃ ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৮ হিজরির, মতান্তরে ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা। হযরত উমার (রা.) তখন ইসলামি খেলাফতের আমির। সে সময় শামে (বর্তমান সিরিয়া, জর্দান, ফিলিস্তিন, লেবানন) দেখা দেয় মহামারী প্লেগ। খলিফা উমার (রা.) সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে জানতে পারেন সিরিয়ায় মহামারী প্লেগ দেখা দিয়েছে। সে সময় হযরত উমার (রা.) ছিলেন প্রায় অর্ধ জাহানের খলিফা। সে সময় সিরিয়া-প্যালেস্টাইনে ছিল হযরত উমারের (রা.) রাষ্ট্রীয় সফর। সফরের উদ্দেশ্যে তিনি মদিনা থেকে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে যান। মদিনা থেকে শামে অবস্থিত তাবুক গ্রামের 'সারগ' নামক এলাকার কাছে এলে সেনাপতি আবু উবায়দাহ ও অন্য নেতাদের সঙ্গে দেখা হয়। উমারকে (রা.) তারা অবহিত করল যে, সিরিয়ায় প্লেগ তথা মহামারী প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। ফিলিস্তিনের আল কুদস ও রামলার মধ্যভাগে অবস্থিত একটি অঞ্চল হলো আমওয়াস বা ইমওয়াস, সেখানে প্লেগ রোগ প্রথম প্রকাশ পায়। অতঃপর তা পুরো শামে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামের ইতিহাস এ ঘটনা **"ত্বউন আমাওয়াস" (طاعون عمواس)** নামে পরিচিত। সিরিয়া মহামারী প্লেগ-এর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়ায় হযরত উমার (রা.) প্রবীণ সাহাবাদের কাছে এ মর্মে পরামর্শ চান যে, তিনি সিরিয়া সফর করবেন নাকি মদিনায় ফিরে যাবেন? সাহাবাদের মধ্য থেকে দুইটি মতামত জানানো হয়।

হযরত উমার (রা.) রাষ্ট্রীয় সফরে মহামারী প্লেগ আক্রান্ত অঞ্চলে যাবেন নাকি মদিনায় ফিরে যাবেন এ নিয়ে ৩টি পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়–

প্রথমটি ছিল : মুহাজির সাহাবীগণের পরামর্শ সভা। কিছু সাহাবা মতামত দিলেন যে, 'আপনি যে উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন, সে উদ্দেশে সফর অব্যাহত রাখেন। অর্থাৎ সিরিয়ায় যাওয়ার পক্ষে মত দেন।' আবার কিছু সাহাবা বললেন, 'খলিফার সিরিয়া যাওয়া উচিত হবে না।'

দ্বিতীয়টি ছিল : আনছার সাহাবীগণের পরামর্শ সভা। উমার (রা.) আনছার সাহাবীদের কাছ থেকেও মুহাজিরদের মত বিপরীতমুখী দু'টি মতামত পেয়ে তাদেরকেও চলে যেতে বললেন।

সবশেষে ছিল : মক্কা বিজয়ের পরে হিজরতকারী প্রবীন কুরাইশদের পরামর্শ সভা। খলিফা উমার (রা.) সবশেষে প্রবীণ কুরাইশদের ডাকলেন। তারা কোনো মতানৈক্য না করে সবাই এ মর্মে মতামত ব্যক্ত করলেন যে-**'সিরিয়ার সফর স্থগিত করে আপনার মদিনায় প্রত্যাবর্তন করা উচিত। আপনি আপনার সঙ্গীদের মহামারী প্লেগের দিকে ঠেলে দেবেন না।'**

হযরত উমার (রা.) প্রবীণ কুরাইশদের মতামত গ্রহণ করে সিরিয়ার সফর স্থগিত করে মদিনায় ফিরে গেলেন।

খলিফার মদিনায় ফেরত যাওয়া দেখে সেনাপতি হযরত উবায়দাহ (রা.) বললেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন! আপনি কি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাকদির থেকে পলায়ন করে ফিরে যাচ্ছেন?'

সেনাপতি হযরত আবু উবায়দাহর (রা.) কাছ থেকে এ কথা শুনে হযরত উমার (রা.) কষ্ট পেলেন। প্রিয় মানুষের কাছে যেভাবে আপনজন কষ্ট পায়। কেননা হযরত আবু উবায়দাহ (রা.) ছিলেন খলিফার অনেক পছন্দ ও ভালোবাসার পাত্র। তাছাড়া সেনাপতি আবু উবায়দাহ (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবাদের অন্যতম একজন।

তখন হযরত উমার (রা.) বললেন, 'হে আবু উবায়দাহ! এ কথাটি তুমি না বলে যদি অন্য কেউ বলতো! তিনি সেনাপতির কথার উত্তরে বললেন- 'হ্যাঁ', আমরা আল্লাহর এক তাকদির থেকে আরেক তাকদিরের দিকে ফিরে যাচ্ছি।' হযরত উমার (রা.) সেনাপতি আবু উবায়দাহকে (রা.) এ কথা বুঝাতে একটি উদাহরণ তুলে ধরেন এবং বললেন- **'তুমি বলতো, তোমার কিছু উটকে তুমি এমন কোনো উপত্যকায় নিয়ে গেলে যেখানে দুইটি মাঠ আছে। মাঠ দুইটির মধ্যে একটি মাঠ সবুজ শ্যামলে ভরপুর। আর অন্য মাঠটি একেবারে শুষ্ক ও ধূসর। এখানে উট চরানো নিয়ে বিষয়টি কি এমন নয় যে, 'তুমি সবুজ-শ্যামল মাঠে উট চরাও। আর তা আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির অনুযায়ীই চরিয়েছ। আর যদি শুষ্ক মাঠে চরাও, তা-ও আল্লাহর তাকদির অনুযায়ী চরিয়েছ।'**

সে সময় হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) একটি হাদিস বর্ণনা করেন। সে হাদিসের বর্ণনায় হযরত আবু উবায়দাহর (রা.) জিজ্ঞাসার পরিপূর্ণ সমাধান ওঠে এসেছে।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) রাসূলুল্লাহর (ﷺ) একটি হাদিস শোনালেন। আর তাহলো-

"তোমরা যখন কোনো এলাকায় মহামারী প্লেগের বিস্তারের কথা শুনো, তখন সেখানে প্রবেশ করো না। আর যদি কোনো এলাকায় এর প্রাদুর্ভাব নেমে আসে, আর তোমরা সেখানে থাকো, তাহলে সেখান থেকে বেরিয়েও যেও না।" এ কথা শুনে উমার (রা.) আলহামদুলিল্লাহ বললেন। অতঃপর সবাই ফিরে গেলেন। (বুখারি, হাদিস : ৫৭২৯)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (ﷺ) প্লেগ সম্পর্কে বলেন,
“এটা হচ্ছে একটা আজাব। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের উপর ইচ্ছা তাদের উপর তা প্রেরণ করেন। তবে, আল্লাহ মুমিনদের জন্য তা রহমতস্বরূপ করে দিয়েছেন। কোনো ব্যক্তি যদি প্লেগে আক্রান্ত জায়গায় সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধরে অবস্থান করে এবং তার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, আল্লাহ তাকদীরে যা লিখে রেখেছেন তাই হবে, তাহলে সে একজন শহীদের সওয়াব পাবে।” (সহীহ বুখারী: ৩৪৭৪)

উমার (রা.) মহামারী চরম আকার ধারণের খবর অবগত হন। উমার (রা.) চাইলেন সেনাপতি আবু উবায়দাহকে (রা.) ফিরিয়ে আনতে। তাই উমার (রা.) একটি চিঠি লিখলেন, ‘তোমার ওপর শান্তি বর্ষণ হোক। তোমার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ সম্পর্কে সরাসরি তোমাকে বলতে চাই। তাই তোমাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বলছি, আমার পত্র পড়ে আমার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার আগে পত্রটি তোমার হাতছাড়া করবে না। রাতে পত্র পৌঁছলে সকাল হওয়ার আগেই যাত্রা শুরু করবে। আর দিনের বেলায় পৌঁছলে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই যাত্রা শুরু করবে।’

আবু উবায়দাহ (রা.) পত্র পড়ে উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেন। তিনি বলেন, ‘আল্লাহ আমিরুল মুমিনিনকে ক্ষমা করুন।’ অতঃপর উমারের (রা.) উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখলেন, ‘হে আমিরুল মুমিনিন, আমি আপনার প্রয়োজনের বিষয় বুঝেছি। আমি এখন মুসলিম সেনাবাহিনীতে অবস্থান করছি। তাদের ছেড়ে যেতে চাই না। আল্লাহ তাআলা আমিসহ সবার ব্যাপারে ফায়সালা করবেন। অতএব হে আমিরুল মুমিনিন, আপনার সিদ্ধান্ত থেকে আমাকে মুক্ত করুন। আমার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে আমাকে ছেড়ে দিন।’

আবু উবায়দাহর (রা.) পত্র পড়ে উমার (রা.) কাঁদতে থাকেন। আশপাশের মুসলিমরা ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হে আমিরুল মুমিনিন! আবু উবায়দা কি শহীদ হয়েছেন? উমার (রা.) বলেন, 'না, তিনি এখনো শহীদ হননি। কিন্তু ...।' অর্থাৎ শিগগির তিনি শহীদ হবেন।' (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/৪৪)

এরপর উমার (রা.) আবু উবায়দাহকে (রা.)পত্রের উত্তরে লিখলেন, **"সালামুন আলাইক। পর সংবাদ এই যে, আপনি মুসলমানদেরকে নিয়ে একটু নিচু এলাকাইয় অবস্থান করছেন, আপনি তাদেরকে নিয়ে অপেক্ষাকৃত উঁচু ও রোগমুক্ত অঞ্চলে চলে আসুন।"** আবু উবায়দাহ (রা.) তেমনটিই করেছিলেন। এ ঘটনায় অসুস্থতা এবং দুর্যোগে সুরক্ষার উপায়-উপকরণ গ্রহণ এবং ব্যাধি সংক্রমণের উৎস থেকে নিরাপদ অবস্থানে সরে যাওয়ার শিক্ষা রয়েছে।

আবু উবায়দাহর (রা.) ইন্তেকালের পর সেনাপতি হন রাসূলের (ﷺ) আরেক প্রিয় সাহাবী মু'আজ ইবনে জাবাল (রা.)। সবাই তখন প্লেগের আতঙ্কে ভীত-সন্ত্রস্ত। নতুন সেনাপতি হবার পর মু'আজ (রা.) একটা ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন:
"এই প্লেগ আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো মুসিবত নয় বরং তাঁর রহমত এবং নবীর দু'আ। হে আল্লাহ! এই রহমত আমার ঘরেও পাঠাও এবং আমাকেও এর যথেষ্ট অংশ দান করুন।" [হায়াতুস সাহাবাঃ ২/৫৮২]

দু'আ শেষে এসে দেখলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয়পুত্র আব্দুর রহমান প্লেগাক্রান্ত হয়ে গেছেন। ছেলে বাবাকে সান্ত্বনা দিয়ে কুরআনের ভাষায় বলেন:

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۝

"সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে। সুতরাং তুমি কখনো সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"
–(সূরা আল-বাকারাহ: আয়াত-১৪৭)

পুত্রের সান্ত্বনার জবাব পিতাও দেন কুরআনের ভাষায়:

سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

"আমাকে ইনশাআল্লাহ আপনি অবশ্যই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।"
–(সূরা আস-সাফফাত: আয়াত-১০২)

কিছুদিনের মধ্যে তাঁর প্রিয়পুত্র প্লেগে আক্রান্ত হয়ে শহীদ হন, তাঁর দুই স্ত্রী শহীদ হন। অবশেষে তাঁর হাতের একটা আঙ্গুলে ফোঁড়া বের হয়। এটা দেখে মু'আজ (রা.) প্রচন্দ খুশি

হন। আনন্দে বলেন, “দুনিয়ার সকল সম্পদ এর তুলনায় মূল্যহীন।” অল্পদিনের মধ্যে তিনিও প্লেগে আক্রান্ত হয়ে শহীদ হন। [আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, ৩/১৫১-১৫২]

শাম থেকে এই ভয়াবহ মহামারী দূর হয়েছিল আমর ইবনুল আস (রা.) ক্ষমতাগ্রহণের পর। তিনি লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে ভাষণে বলেন, **‘হে লোকসকল, এই মহামারী যখন ছড়িয়ে পড়ে, তখন আগুনের মতো দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। তাই এ থেকে বাঁচতে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিন। আগুন যখন জ্বালানোর মতো কিছু না পাবে, তখন এমনিতেই নিভে যাবে।’** এই আদেশ শুনে একজন সাহাবী প্রতিবাদ করে বললেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহর (ﷺ) সঙ্গী ছিলাম। আল্লাহর কসম, আপনি ভুল করছেন। আপনি আমার গাধার চাইতেও বেশি বিভ্রান্ত।' স্থিতধী আমর ইবনুল আস (রা.) এমন অপমানের পরেও ক্রুদ্ধ হলেন না। শুধু বললেন, ‘আমি আপনার উত্তর দিয়ে আপনার কথাকে মহীয়ান করব না। আপনাকে শাস্তিও দেবো না।’ অতঃপর লোকেরা তার আদেশ মেনে দলে দলে গিয়ে বের হয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ এই মহামারীকে উঠিয়ে নেন। আমর ইবনুল আসের (রা.) গৃহীত এই পদক্ষেপ উমারের (রা.) কানে পৌঁছায়। তিনি এটিকে অপছন্দ করেননি। এখান থেকে আমরা মহামারীর সময়ে একে অপর থেকে পৃথক হওয়ার এবং জমাটবদ্ধ না হওয়ার বৈধতা পাই।

এই মহামারী শামে গুরুতর আকার ধারণ করেছিল। এতে বিশ হাজারের অধিক মুসলমানের মৃত্যু হয়েছিল। যাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সাহাবী এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তাদের মধ্যে আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ, মুয়াজ ইবনু জাবাল, ইয়াজিদ ইবনু সুফিয়ান, হারিস ইবনু হিশাম (তাঁর সম্পর্কে এও বলা হয় যে তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন), সুহাইল ইবনু আমর, উতবা ইবনু সুহাইল প্রমুখ সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন) ইন্তেকাল করেন।

এই মহামারীর পর মুসলিম বিশ্বে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে রাষ্ট্রের ভিত্তি ভেঙ্গে পড়ে। উমার (রা.) জনগণের কাছে খাবার পৌঁছানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন এবং তিনি সকল প্রকারের উন্নতমানের খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। আবু ওসমান আন-নাহদী (রহ.) বলেন, আমরা আজারবাইজানে ছিলাম। এ সময় উমার (রা.) আমাদের (দলনেতার) কাছে চিঠি লিখলেন, হে উতবাহ ইবনু ফারকাদ! এ ধন-সম্পদ তোমার কষ্টার্জিত নয়, তোমার পিতামাতারও কষ্টার্জিত নয়। তাই তুমি যেরূপ নিজ বাড়িতে পেটপুরে ভক্ষণ কর, তেমনিভাবে মুসলিমদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তাদেরকেও পেটপুরে আহার করাও। আর সাবধান, মুশরিকদের ভোগ-বিলাস, বেশভূষা এবং রেশমী কাপড় পরিধান করা থেকে বিরত থাকবে।

কেননা রাসূল (ﷺ) রেশমী কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন’।[মুসলিম হা/২০৬৯; ছহীহুত তারগীব হা/২২০৩]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) দুর্ভিক্ষের বছর পল্লী অঞ্চলের বেদুঈনদের নিকটে উট, খাদ্যশস্য ও তৈল প্রভৃতি সামগ্রী পৌঁছাবার চেষ্টা করেন। এমনকি তিনি গ্রামাঞ্চলের এক খন্ড জমিও অনাবাদী পড়ে থাকতে দেননি। তাঁর এ চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়। উমার (রা.) দু‘আ করেন, ‘হে আল্লাহ! আপনি তাদের রিযিক পর্বত চূড়ায় পৌঁছে দিন’। তাঁর ও মুসলমানদের দু‘আ আল্লাহ কবুল করলেন। তখন বৃষ্টি বর্ষিত হলে তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর শপথ! যদি আল্লাহ এই বিপর্যয় দূর না করতেন, তবে আমি সচ্ছল মুসলমান পরিবারের সাথে সম-সংখ্যক অভাবী লোককে যোগ না করে ছাড়তাম না। যতটুকু খাদ্যে একজন জীবন ধারণ করতে পারে, তার দ্বারা দু’জন লোক ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে পারে।[বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৬২, সনদ ছহীহ]

২৪ হিজরীর মহামারীঃ ২৪ হিজরীর মহামারী মিসরে দেখা দেয়। এই মহামারীতে কবি আবু যুওয়াইব আল-হুযালীর পাঁচজন সন্তান মারা যায়। এই মহামারীর উৎস সম্পর্কে ইবনু বাত্তা আকবরী বলেন, এই মহামারী প্রথম ‘দাব’ নামক স্থানে দেখা যায়। তখন শামের শাসক ছিলেন মু‘আবিয়া (রা.)। তিনি ঘটনা জানতে পেরে তাদেরকে এলাকা থেকে সরিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু আবুদ্দারদা (রা.) প্রতিবাদ করে বলেন, হে মু‘আবিয়া! তাদের সাথে এমন আচরণ করবেন কিভাবে যাদের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়ে গেছে? এরপরে মহামারী হিমছ ও দামেশকে ছড়িয়ে পড়ে। মু‘আবিয়া (রা.) অন্যত্র চলে যান। এরই মধ্যে এই মহামারী মিসরে ছড়িয়ে পড়ে।[*কিতাবুল ইবানাহ হা/১৮১৭, ২/২২৬; ইবনুল ক্বাইয়িম, শেফাউল আলীল ১/২১]*

কূফার মহামারীঃ আবূ মূসা আশ‘আরী (রা.) দু’বার কূফার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর শাসনামলে কূফায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এই মহামারীর ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জানা যায় না। তবে এটি হিজরী ৪৪ সনের পূর্বে ঘটেছিল। কারণ তিনি ৪৪ হিজরী সনে মারা যান।[*হাফেয ইবনু হাজার, বাযলুল মাঊন ফী ফাযলিত ত্বাঊন ৩৬২ পৃ:*] ঐতিহাসিকগণ এই মহামারীর কথা উল্লেখ করলেও সাল উল্লেখ করেননি। সাহাবী তারিক বিন শিহাব বাজালী (রা.) বলেন, أَتَيْنَا أَبَا مُوسَى وَهُوَ فِي دَارِهِ بِالْكُوفَةِ لِنَتَحَدَّثَ عِنْدَهُ فَلَمَّا جَلَسْنَا قَالَ: لَا تَحِفُّوا فَقَدْ أُصِيبَ فِي الدَّارِ إنسان بهذا السقم، ولا عليكم أن تتنزهوا عَنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَتَخْرُجُوا فِي

فَسِيحِ بِلَادِكُمْ وَنُزَهِهَا، حَتَّى يَرْتَفِعَ هَذَا الْبَلَاء، ‘মহামারীর সময়ে আলোচনা করার জন্য কয়েকজন লোকসহ আমরা আবূ মূসা আশ‘আরী (রা.)-এর কাছে আসলাম। তিনি তখন তার কূফার বাড়িতেই অবস্থান করছিলেন। সেসময় তিনি কূফার গভর্নর। আমরা সঙ্গীদের নিয়ে যখন বসতে গেলাম, তখন আবূ মূসা আশ‘আরী (রা.) বলে উঠলেন, আপনারা নগ্নপায়ে হাঁটবেন না। কারণ এ ঘরে একজন লোক মহামারীতে আক্রান্ত। আর মহামারীর প্রাদুর্ভাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের জন্য এই গ্রাম থেকে বেরিয়ে নিজ দেশের প্রশস্ত যমীনে ও তার মুক্ত বাতাসে গমন করাও সমীচীন হবে না।[*ইবনু জারীর আত-তাবারী, তারীখে তাবারী ২/৪৮৭; তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলক ২/৩৩৯; আল-বিদায়াহ ৭/৭৮, ৭/৯০]*

৪৯/৫০ হিজরীর মহামারীঃ ৪৯ হিজরীতে কূফায় এক ভয়াবহ মহামারী আঘাত হানে। এতে সাহাবী মুগীরা বিন শু‘বাহ (রা.) মৃত্যুবরণ করেন। কূফায় মহামারী ছড়িয়ে পড়লে মুগীরা বিন শু‘বাহ (রা.) সেখান থেকে অন্যত্র চলে যান। যখন শুনতে পান যে মহামারী দূর হয়েছে তখন তিনি কূফায় ফিরে আসেন। কিন্তু মহামারী তখনও কিছুটা বিদ্যমান ছিল। ফলে তিনি সে মহামারীতেই আক্রান্ত হয়ে মারা যান।[*তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলুক ৩/১৮৫; আল-বিদায়াহ ৮/৩৭; আন-নুজূমুয যাহেরাহ ১/৫৭; আল-কামেল ফিত তারীখ ২/১২৬; মাসূদী, মুরূজুয যাহাব ১/৩৫৮]*

৫৩ হিজরীর মহামারীঃ এই মহামারী ইসলামের ইতিহাসে পঞ্চম মহামারী হিসাবে পরিচিত। এতে যিয়াদ বিন আবীহ তথা যিয়াদ বিন আবূ সুফিয়ান মারা যায়। এই যিয়াদ বিন আবীহ বছরা ও কূফার ক্ষমতা গ্রহণ করে মু‘আবিয়ার (রা.) নিকট পত্র লিখেন যে, আমাকে এখন হেজাযের আমীর নিযুক্ত করা হোক। এই চিঠির কথা মদীনাবাসী বিশেষ করে ইবনু উমার (রা.) জানতে পারলে তার বিরুদ্ধে বদদো‘আ করেন। এরপরেই সে মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।[*আন-নুজূমুয যাহেরাহ ১/৫৭; তারীখুল ইসলাম ৪/২১০; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৩/৪৯৬]*

মিসরীয় মহামারীঃ হিজরী ৬৬ সনে মিসরে মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। ঐতিহাসিক মাদায়েনী বলেন, এই মহামারী ছড়িয়ে পড়লে মিসরের আমীর আব্দুল আযীয বিন মারওয়ান পলায়ন করে মরুভূমিতে অবস্থিত হুলওয়ান নামক একটি গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ঐ গ্রামেই মারা যান। অবশ্য কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন তিনি ৮৫ হিজরীর মহামারীতে হুলওয়ানে মারা যান’।[*সুয়ূতী, হুসনুল মুহাযেরা ফী আখবারে মিসর ওয়াল ক্বাহেরাহ ১/৩০৫; বাযলুল মাঊন ফী ফাযলিত ত্বাঊন ১/৩৬২]*

জারিফ মহামারীঃ ৬৯ হিজরিতে জারিফ মহামারী ছড়িয়ে পড়ে বসরা নগরীতে। আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.)-এর খেলাফতকালে। মৃতের সংখ্যাধিক্যের কারণে এ মহামারীর নাম হয়েছিল জারিফ। জারিফ শব্দের অর্থ সুদূরপ্রসারিত। এই মহামারীতে মৃতের মিছিল প্লাবনের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল।

ফাতায়াত মহামারীঃ ৮৭ হিজরীতে ইরাক এবং বৃহত্তর সিরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে আরেক মহামারী। এটিকে তাউনু ফাতায়াত বা যুবতীদের মহামারী বলা হয়। কারণ, প্রথমে এটি মহিলা এবং কুমারীদের মাঝে ছড়িয়েছিল। অতঃপর পুরুষদের মাঝে ছড়িয়েছে। এটিকে তাউনু আশরাফও বলা হয়। কারণ, এতে সম্ভ্রান্ত এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মৃত্যু হয়েছিল অধিক হারে।

তাবেঈদের যুগে মহামারী এবং তাদের অবস্থান

উমাইয়া শাসনামলের সর্বশেষ মহামারী ছিল ১৩১ হিজরীর **তাউনু কুতাইবা ইবনু মুসলিম**। এ মহামারীতে সবার আগে ইন্তেকাল করেন বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি কুতাইবা ইবনু মুসলিম। তার নামেই নামকরণ করা হয় এই মহামারীর। বসরায় আপতিত হওয়া এই মহামারীর স্থায়ীত্ব ছিল তিন মাস। রমজান মাসে এটি গুরুতর আকার ধারণ করে। তখন একইদিনে একহাজারের অধিক জানাজা পড়া হতো।

এর কয়েক শতাব্দী পরে ৩৯৫ হিজরীতে মরক্কো ও আন্দালুস তথা আজকের স্পেনে মহামারীর কারণে দ্রব্যমূল্যের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে যায়। ধনী-গরীব সকলেই মারা যেতে থাকে। শহরের যে কোন মানুষকে দেখলে দেখা যাবে, সে রোগী দেখতে রেরিয়েছে কিংবা কোন রোগীর সেবা করছে, কিংবা কোন মৃতের জানাযা প্রস্তত করছে। কায়রাওয়ান শহরের মসজিদগুলো বিরান হয়ে পড়ে।[আল বায়ানুল মুগরিব ফী আখবারিল আন্দালুস ও ওয়াল মাগরিব, ইবনু উযারী আল মারাকিশী]

হিজরী ৪৪৮ সনে স্পেনে সংঘটিত এক মহামারীর বর্ণনায় ইমাম যাহাবী বলেন, আন্দালুসে (স্পেন) বড় ধরণের মহামারী দেখা দেয়। মানুষ দুর্ভিক্ষে নাকাল হয়ে পড়ে। এমনকি ইশবিলিয়াতে (সেভিল) অসংখ্য মানুষ মারা যায়। মসজিদগুলো বন্ধ হয়ে যায়। নামাজ পড়ার ও পড়াবার মতো কেউ বাকী ছিল না।[তারিখুল ইসলাম]

পরবর্তী বছর ৪৪৯ হিজরীতে মধ্যএশিয়াতে হানা দেয়া এক মহামারীতে প্রায় দুই মিলিয়ন মানুষ মারা যায়। যার প্রভাব ইরাক পর্যন্ত চলে এসেছিল। ইবনুল জাওযীর সূত্রে যাহাবী বলেন, “৪৪৯ হিজরীর জুমাদাল উখরাতে 'মা ওয়ারা আন্নাহার' এর এক ব্যবসায়ীর চিঠি আসে। সেখানে মধ্য এশিয়া অঞ্চলে মরণঘাতী মহামারীর বর্ণনা দেন ব্যবসায়ী। একদিনে আঠার হাজার মানুষের জানাযার কথা জানান তিনি। আরেক গ্রন্থে মৃতের সংখ্যা ষোল লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বলে উল্লেখ করা হয়। ইবনুল জাওযী উল্লেখ করেন, “রাস্তাঘাট ফাঁকা। বাজারে লোক নেই। সকল বাড়ির দরজা বন্ধ। ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু স্থগিত। রাতদিনের কাজ শুধু মৃতদের গোসল, দাফন ও কাফন। অধিকাংশ মসজিদ জামাত থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে”।[তারিখুল ইসলাম]

৪৭৮ হিজরিতে এক মহামারী ছড়িয়ে পড়ে ইরাক, সিরিয়া এবং হিজায অঞ্চল জুড়ে। এর ধরণটা ছিল প্রচণ্ড জ্বর হতো। মানুষজন, পশুপাখি, মোট কথা প্রাণীজগৎ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। চারিদিকে মৃত্যুর মিছিল শুরু হয়। আমিষের অভাবে ভুগছিল লোকজন। এক প্রকার কালো বাতাস আর বজ্রপাত গাছপালা উপড়ে ফেলছিল। লোকেরা ভাবতে শুরু করল কিয়ামত বুঝি চলে এসেছে! এই মহামারী প্রতিরোধ করতে তৎকালীন আব্বাসি খলিফা আল-মুকতাদী বি-আমরিল্লাহ (মৃত্যু ৪৮৭ হি.) নির্দেশ জারী করলেন, সবাই যেন আমর বিল-মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল-মুনকার করে; অর্থাৎ সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে বাঁধা প্রদানে নেমে পড়ে। এতে করে সকল বাদ্য-যন্ত্র গুঁড়িয়ে দেয়া হলো। ভেঙে চুরমার করে দেয়া হলো মদের বোতল। আর দুর্নীতি সমূলে উচ্ছেদ করা হলো দেশ থেকে। ফলশ্রুতিতে কিছু কাল যেতেই সেই রোগ দূর হয়ে গেল।[বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ১৩/২১৬]

ইবনু কাসির বলেন, ৬৫৬ হিজরিতে মঙ্গলরা যখন বাগদাদকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়, তখন মসজিদ-মাদ্রাসাগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। বেশ কয়েক মাস বন্ধ হয়ে থাকে জামায়াত এবং জুমার নামাজ আদায়। মঙ্গোলরা চলে যাওয়ার পর চল্লিশদিন পর্যন্ত বাগদাদ বিরান অবস্থায় পড়ে থাকে। গুটিকয়েক মানুষ শুধু ছিল সেখানে। বাগদাদের পথে পথে কাটা বৃক্ষের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়েছিল লাশের পর লাশ। বৃষ্টি নেমে এলে পাল্টে যায় লাশের অবস্থা। পুরো বাগদাদ তাদের লাশের দুর্গন্ধে দূষিত হয়ে যায়। দূষিত বাতাসের কারণে ছড়িয়ে যায় মহামারী। এ বাতাস ছড়িয়ে পড়ে বৃহত্তর সিরিয়াতেও। পরিবেশ বিপর্যয় এবং দূষিত আবহাওয়ার কারণে সেখানেও অনেক লোকের মৃত্যু হয়। মানুষ হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত।[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/২০৩]

৭৪৮ হিজরী মোতাবেক ১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দে মামলুকদের শাসনামলে বৃহত্তর সিরিয়া মুখোমুখি হয় আরেক মহামারীর। এ মহামারীতে সিরিয়ার অধিকাংশই অঞ্চলই আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এ কারণে এই মহামারীকে **'তাউনে আজম'** বলা হয়ে থাকে। আলেপ্পো, দামেস্ক, জেরুজালেম এবং উপকূলীয় শহরগুলোর অধিবাসীদেরকে এই মহামারী প্রায় নিঃশেষ করে দেয়। এমনিভাবে ৭৯৫ হিজরী মোতাবেক ১৩৯২ খ্রিষ্টাব্দে আলেপ্পোতে ছড়িয়ে পড়ে অপর এক ব্যাধি। যার নাম দেয়া হয় 'আল-ফানাউল আজিম' তথা মহাধ্বংস। এ মহামারীর করাল গ্রাসে আলেপ্পো এবং পার্শ্ববর্তী জনপদ থেকে ঝরে পড়ে দেড় লক্ষ মানুষের প্রাণ।

৭৪৯ হিজরীতে ইউরোপে **'ব্ল্যাক ডেথ'** নামে পরিচিত মহামারী প্রসঙ্গে মাকরিযী বলেন, মানুষের মধ্য থেকে সকল ধরণের আনন্দ উবে যায়। এ সময় কেউ আনন্দের সাথে কোন

কাজ করেছে, এমন দেখা যায়নি। কোন গানের আওয়াজ শোনা যেত না। বিভিন্ন মসজিদে আযান বন্ধ হয়ে যায়। এবং অধিকাংশ মসজিদ ও মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট খানকা বন্ধ হয়ে যায়।[আননুযুমুয যাহিরাহ, আস সুলুক লি মারিফাতিল মুলুক] প্রায় একই সময়ে প্লেগের ভয়াবহতায় সিরিয়ার দামেস্ক শহর ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। মুরব্বিরা সিদ্ধান্ত নিলেন, শহরের বাইরে গিয়ে সবাই জমায়েত হয়ে সম্মিলিতভাবে দোয়া করবেন। কিন্তু এর ফল হলো ভয়াবহ। আরও দ্রুত ছড়াতে শুরু করল প্লেগ। মৃত্যুহার বেড়ে গেল জ্যামিতিক হারে।

হিজরী ৮২৭ সালে মক্কাতে বড় ধরণের মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিদিন গড়ে চল্লিশ জনের জানাজার আয়োজন হতে থাকে। রবিউল আওয়াল মাসেই এক হাজার সাতশত মানুষ মারা যায়। **তখন মাকামে ইব্রাহিমে ইমামের সাথে মাত্র দুইজন ব্যক্তি নামাজ পড়েছেন সেখানে।** [ইনবাউল গুমার বি আবনাউল উমার, ইবনু হাজার] এখানে কি সরকারী নিষেধাজ্ঞা ছিল নাকি স্বেচ্ছায় মানুষ বিরত থেকেছে, তা বলা কঠিন।

৮৩৩ হিজরীতে সংগঠিত এক মহামারীর প্রসঙ্গে ইবনু হাজার আসক্কালানী বলেন, সরকারী কর্মকর্তা শরীফ বংশের চল্লিশ জনকে একত্রিত করেন, যাদের সকলের নাম ছিল মুহাম্মাদ। তারা জুমার নামাজ থেকে আছর পর্যন্ত তেলাওয়াত করেন। ফলে দলে দলে মানুষ জমা হতে থাকে। **ইবনু হাজার বলেন, এরপরই অজ্ঞাত কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকায় মহামারী আশংকাজনকভাবে বেড়ে যায়** ।[ইনবাউল গুমার]
এরপর সপ্তাহ না ঘুরতেই ৪০ জন ছাড়িয়ে দিনে হাজারের বেশি মানুষ মারা যেতে শুরু করলেন।

অন্যদিকে ৮৪৮ হিজরীতে মিসরে একটি মহামারী দেখা দেয়। দৈনিক এক-দুই শত মানুষ মারা যেতে থাকে। **তখন হেজায থেকে হাজীদের জামাত ফিরে আসে মিসরে। মানুষ তাদের অভিবাদন জানায়। তারপর থেকে মৃত্যুর হার আরও বেড়ে যায়। দৈনিক হাজার ছাড়িয়ে যায়।** ধারণা করা হয়, সেদিন হাজীদের সাথে প্রচুর মানুষের মেলামেশা-দেখাসাক্ষাৎ হয় । যেটা মহামারী ছড়াতে সহায়ক হিসেবে কাজ করে। ইবনু হাজার বলেন, মহামারী থেকে বাঁচতে কাযী ইবনু আবী জারদাহ বাড়িতে অবস্থানের জন্য ডাক্তারকে অর্থ দেন। এবং তিনি অসুস্থতার ভান করেন। যাতে তাকে কোন জানাযায় ডাকা না হয় এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে মহামারী থেকে নাজাত দেন।[ইনবাউল গুমার]

এরকম সংকটপূর্ণ সময়ে মুসলমানরা কখনোই আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তিতা এবং তাঁর কাছে দোয়া করার কথা ভুলে যায়নি। নেককার এবং সৎ ব্যক্তিগণ আল্লাহ তা'আলার কাছে তওবা, ইস্তেগফার করেছেন। অধিক পরিমাণে ইবাদতে লিপ্ত হয়েছেন। আল্লাহর প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধির জন্য তারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন মদের দোকান এবং বিনোদন কেন্দ্রগুলোকে। মানুষ দূর হয়ে গিয়েছিল অসৎ কাজ এবং পাপাচারের জগত থেকে। সেই সাথে সোশ্যাল ডিস্টান্স তথা কোয়ারেন্টাইন বিষয়েও দরকারি দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তারা। ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে মাগরিব তথা মরক্কো এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে মহামারী ছড়িয়ে পড়ার পর তারা কোয়ারেন্টিন তথা সঙ্গনিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং প্রাচ্য থেকে আগত এই দুর্যোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ মহামারীর প্রকোপ থেকে বাঁচতে সক্ষম না হলেও তারা এটির আগমনকে কয়েক বছর পিছিয়ে দিয়েছিল। এটি প্রথমে ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ছড়িয়েছিল।

আলজেরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর মহামারীর আগমনকে বিলম্বিত করতে মরক্কোর শাসক সাইয়িদি মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ মরক্কোর মহাসড়কগুলোতে বসিয়েছিলেন সামরিক পাহাড়া। ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে এই মহামারী থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা প্রণয়নে টাঙ্গিয়ারে একটি কাউন্সিল গঠন করা হয়েছিল। তারা সামুদ্রিক দিক থেকে সংক্রমন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কোয়ারেন্টিনের আদেশ দিয়েছিলেন। এর আগে মাওলা সুলাইমান মহামারী আক্রান্ত আলজেরিয়াতে কোয়ারেন্টিন আবশ্যক করেছিলেন।

ছোঁয়াচে রোগ ও মহামারীতে রাসূল (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল

নবী (ﷺ) এর আমলঃ

নবী (ﷺ) একবার সাহাবীদের নিকট থেকে বায়আত নিচ্ছিলেন। বায়আতের সময়ে হাতে হাত রাখতে হয়। এসময় বায়আত নিতে আগত সাকিফ গোত্রীয় প্রতিনিধি দলের মাঝে একজন কুষ্ঠ রোগী ছিলেন। কুষ্ঠ একটি ছোঁয়াচে রোগ। [১] নবী (ﷺ) তাঁর কাছে সংবাদ পাঠালেন যেঃ আমরা তোমাকে বায়আত করে নিয়েছি। তুমি ফিরে যাও। হাদিসটি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে। আমরা এখানে লক্ষ করলাম যে, নবী (ﷺ) এই ছোঁয়াচে রোগীর সংস্পর্শে না এসে তাঁকে ফিরে যাবার জন্য বার্তা দিলেন।

মহানবী (ﷺ) আরেক হাদীসে বলেছেন,

لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

"**চর্মরোগাক্রান্ত উটের মালিক যেন সুস্থ উট দলে তার উট না নিয়ে যায়।**" (বুখারী ৫৭৭১, মুসলিম ৫৯২২নং)

আরেক হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "রোগের সংক্রমণ ও অশুভ লক্ষণ বলতে কিছুই নেই। পেঁচার ডাকে অশুভ কিছু নেই, সফর মাসেও অশুভ কিছু নেই, **আর কুষ্ঠরোগী থেকে সেই রকম পলায়ন কর, যে রকম সিংহ থেকে পলায়ন কর।**" (বুখারী ৫৭০৭, মিশকাত ৪৫৭৭নং)

হাদীসের অর্থ হবে, সংক্রামক ব্যাধি আছে, তা থেকে দূরে থাক, সে রোগকে বাঘের মত ভয় কর। তবে এ কথাও মনে রেখো যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন রোগ তোমার শরীরে সংক্রমণ করতে পারে না।

মক্কা-মদীনা ও শামের সাহাবীদের আমল

একবার এক কুষ্ঠ আক্রান্ত মহিলা কা’বায় তাওয়াফ করছিলেন। এটা দেখে উমার (রা.) তাঁকে বললেন, “হে আল্লাহর দাসী, অন্য মানুষকে কষ্ট দিও না। হায়, তুমি যদি তোমার বাড়িতেই বসে থাকতে!” এরপর সেই মহিলা বাড়িতে অবস্থান করতে লাগলেন। ঘটনাটি ইমাম মালিক (র.) এর মুয়াত্তায় বর্ণিত আছে। আমরা জানি যে কা’বায় তাওয়াফের সময় সেখানে অনেক মানুষ থাকে। উমার (রা.) তাঁকে এই ছোঁয়াচে রোগ নিয়ে কা’বায় তাওয়াফ করতে নিষেধ করে বাড়িতে অবস্থান করতে বলেছিলেন।
তাছাড়া আমাওয়াসের প্লেগের ঘটনায় আমরা উমার (রা.), আমর ইবনুল আস (রা.) প্রমুখ সাহাবীর গৃহীত সিদ্ধান্তের কথা জেনে এসেছি।

উপরের ঘটনাগুলো ভালো করে লক্ষ করি —

১। স্বয়ং নবী (ﷺ) একজন ছোঁয়াচে রোগীর সংস্পর্শে না এসে হাত দিয়ে তার বায়আত নেননি। তিনি যদি সত্যিই এটা বুঝিয়ে থাকতেন যে সংক্রামক ব্যধি বলে কিছু নেই, তাহলে কেন এটি করলেন? আজকে অনেক মুসলিমও ভুল ব্যাখ্যা করে বলছেনঃ সংক্রামক রোগ বলে কিছু নেই, সতর্কতা অবম্বনের প্রয়োজন নেই। আমরা কি আজ নিজেদেরকে রাসূল (ﷺ) এর চেয়েও বেশি তাকওয়াবান ভাবছি?

২। এক মহিলার কা’বায় তাওয়াফ করার ঘটনাতে আমরা দেখলাম যে, পূণ্যময় কাজ হওয়া সত্ত্বেও উমার (রা.) তাঁকে সেটি করতে নিষেধ করছিলেন। কারণ সেই মহিলা ছিলো কুষ্ঠ আক্রান্ত। কা’বায় তাওয়াফের স্থানে ব্যাপক জনসমাগম হয়। এক্ষেত্রে উমার (রা.) অন্য মানুষদের অসুবিধার কথা ভেবে এ কাজ থেকে সেই মহিলাকে বারণ করেছিলেন। লক্ষ করি উমার (রা.) সেখানে কী বলছিলেনঃ “...অন্য মানুষকে কষ্ট দিও না... তুমি যদি তোমার বাড়িতেই বসে থাকতে।” আধুনিক যুগেও আমরা দেখি যে ছোঁয়াচে রোগাক্রান্ত মানুষকে জনসমাগমের মাঝে যেতে নিষেধ করে গৃহে অবস্থান করতে বলা হয়। একে বলা হয় Home isolation।

৩। শামে যাবার পথে বৈঠকে বয়োজ্যেষ্ঠ মুহাজির সাহাবীগণ উমার (রা.) কে বলেছিলেনঃ ” আপনি লোকজনকে নিয়ে ফিরে যান এবং তাদেরকে এই মহামারীর কবলে ঠেলে দেবেন না”। এ থেকে বোঝা গেলো রাসূল (ﷺ) এর সাহাবীগণ রোগের সংক্রমণে বিশ্বাস করতেন

এবং তারা মোটেও রাসূল (ﷺ) এর হাদিস থেকে এটা বোঝেননি যে ছোঁয়াচে রোগ বলে কিছু নেই। তাঁরা যদি এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে রোগের সংক্রমণে বিশ্বাস না-ই করতেন, তাহলে এই কথা কেন বললেনঃ "তাদেরকে এই মহামারীর কবলে ঠেলে দেবেন না" ? এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সাহাবীরা মনে করতেন মহামারী কবলিত এলাকায় গেলে সুস্থ মানুষও এতে আক্রান্ত হতে পারে।

৪। রাসূল (ﷺ) থেকে হাদিস রয়েছে, কোনো এলাকায় সংক্রামক মহামারী হলে সেখানে প্রবেশ না করতে বা সেখান থেকে বেরিয়ে না যেতে। উপরের বিবরণে আমরা এটিও দেখলাম যে এই হাদিসের আলোকে রাসূল (ﷺ) এর সাহাবীগণ মহামারী কবলিত শামে প্রবেশ থেকে বিরত ছিলেন। আমরা আধুনিক যুগেও দেখি সংক্রামক রোগাক্রান্ত অঞ্চলের ব্যাপারে একই রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় যাতে সেখানে গিয়ে অন্যরা আক্রান্ত না হয় এবং সেখান থেকে রোগটি বাইরে ছড়িয়ে না যায়। ইসলামে যদি সংক্রামক ব্যধিকে অস্বীকার করা হতো, তাহলে রাসূল (ﷺ) কেন এমন আদেশ দিয়েছিলেন?

৫। আলোচ্য ঘটনা থেকে আরো বোঝা গেলো সংক্রামক রোগ থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা এবং আক্রান্তদের থেকে দূরে থাকা মোটেও তাকদির অস্বীকার করা নয়, শির্ক নয়, তাকওয়ার খেলাফ নয়। উমার (রা.) শামে যাবার পথের সেই ঘটনায় তাকদিরের ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছেন। রাসূল (ﷺ) এর সাহাবীগণ শির্কে লিপ্ত হননি বা তাকওয়ার ক্ষেত্রেও তাঁদের কমতি ছিলো না। বরং তাঁরা রাসূল (ﷺ) এর হাদিস থেকেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

৬। আমরা উপরে দেখলাম যে, শাম অঞ্চলের মধ্যে সাহাবীরা ঐ এলাকায় একসাথে না থেকে পাহাড়ী এলাকায় ফাঁকা ফাঁকা হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছিলেন। যাতে সংক্রামক রোগটি তাঁদের মধ্যে সহজে ছড়িয়ে যেতে না পারে। আমর ইবনুল আস (রা.) এর বক্তব্যটি পুনরায় লক্ষ করিঃ "এই রোগের যখন প্রাদুর্ভাব হয় তখন আগুনের ন্যায় লেলিহান শিখা ছড়িয়ে জ্বলতে থাকে। সুতরাং তখন তোমরা পাহাড়ে গিয়ে তা থেকে আত্মরক্ষা করো।" শামের সাহাবীরা এর উপরেই আমল করেছেন। আধুনিক যুগেও ছোঁয়াচে রোগের সংক্রমণ হ্রাস করার জন্য এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় যাকে বলে Social distancing।

মহামারী বিষয়ে সালাফদের লিখিত গ্রন্থসমূহ

ফিলিস্তিনের গাজা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'আল কাওয়ারিসুত তবিয়িয়্যা ফি বিলাদিশ শাম ও মিসর' (শাম ও মিসরের প্রাকৃতিক দুর্যোগ) নামক একটা এমফিল পত্রে বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক যত দুর্যোগ আছে, যেমন দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, মহামারি, পঙ্গপালের হামলা ইত্যাদির মধ্যে মুসলমান ফকিহ ও চিকিৎসকগণ সবচেয়ে বেশি লেখালেখি করেছেন মহামারী বিষয়ে। বোঝা যায়, ইসলামের ইতিহাসে মহামারীকে ঘিরে উক্ত প্রশ্নগুলো সবসময়ই আবর্তিত ছিল। মহামারীকে নিয়ে আলেমগণের পৃথক অনেক গ্রন্থেরও অস্তিত্ব আছে।

এর মধ্যে তাজুদ্দিন সুবকির কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি মহামারী সম্পর্কে লিখেছিলেন 'জুযউন ফিত তাউন'। শিহাবুদ্দিন ইবনে আবি হাজালা তিলমেসানী লিখেছিলেন মহামারী বিষয়ে 'আত-তিব্বুল মাসনুন ফি দাফইত তাউন' (মহামারী মোকাবেলায় শরীয়ার প্রতিকার)। এছাড়াও আছেন ঐতিহাসিক ইবনুল ওয়ারদি। যিনি 'আননাবা আনিল ওবা' নামে বিবরণমূলক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন মহামারী নিয়ে। এর মধ্যে তার পূর্বের যুগগুলোর মহামারীর কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তার যুগের বিবরণ কিছুটা লিপিবদ্ধ করে আর সামনে এগুতে পারেন নি। ৭৪৯ হি. সালের মহামারী তার প্রাণ নিয়ে যায়।

ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) (৭৭৩ – ৮৫২ হি.) তার যুগে মহামারীর প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির কারণে একটা গ্রন্থ রচনা করেন মহামারী নিয়ে। নাম 'বাজলুল মাঊন ফি ফাদতিত তাউন' (মহামারীর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায় স্বল্প প্রয়াস) নামে। এই গ্রন্থে তিনি বলেছেন, "আল্লাহ মহামারী সৃষ্টি করেছেন কাফের সম্প্রদায়ের শাস্তি ও আজাবস্বরূপ।" এক্ষেত্রে তিনি ঐসব বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ দিয়েছেন, যাতে মহামারী দ্বারা পূর্ববর্তী জাতিদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার বিবরণ আছে। আর তিনি মহামারীকে মুসলমানদের জন্য রহমতস্বরূপ বলে মত দিয়েছেন। দলিল দিয়েছেন ঐসব হাদিস দ্বারা যাতে বর্ণিত হয়েছে, "মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে মুমিনরা জান্নাতে যাবে।" এই গ্রন্থ লেখা শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই তার দুই মেয়ে আলিয়া ও ফাতেমা ৮১৯ হি. সালে মারা যায় সেই মহামারীতে।

এছাড়াও আরো অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে মহামারীকে কেন্দ্র করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, দার্শনিক ইয়াকুব আল-কিন্দীর (২৫৪ হি.) 'রিসালাতুন ফিল আবখারাতিল মুসলিহাতি লিল জাওয়ি মিনাল আওবিয়া' (পরিবেশকে মহামারী-শোধন করতে কিছু উপকারী ধূম্র)।

আছে হাফেজ ইবনে আবিদ্দুনয়ার (২৮১ হি.) 'কিতাবুত তাওয়াইন'। আছে ইবনুল কায়্যিম জাওযিয়ার (৭৫১ হি.) 'কিতাবুত তাউন'। বদরুদ্দিন যারকাশী (৭৯৪ হি.) লিখেছেন 'রিসালাতুন ফিত তাউন'। জালালুদ্দিন সুয়ূতী (৯১১ হি.) লিখেছেন 'মা ওরায়ার ওয়াউন ফি আখবারিত তাউন' এবং 'আল মাকামাতুত তাউনিয়্যা'।

পঞ্চাদশ শতকের একজন যুগসচেতন আলেম ছিলেন ইদরিস বিন হুসামুদ্দিন বাদলিসী (৯৩০ হি. মোতাবেক ১৫২৪ ঈ.)। তিনি একবার হজ্বযাত্রা করেছিলেন তুরস্কের কনস্টান্টিনোপল থেকে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ার সমুদ্র পথে। কিন্তু ফেরার পথে তিনি জানতে পারলেন, মিসরে মহামারীর প্রকোপ চলছে। তাই মিসরে আর ঢুকলেন না, প্রবল ইচ্ছা থাকার পরও। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দামেস্ক ও হালাবের কতক আলেম তার সমালোচনায় রত হলেন। তখন তিনি তাদের জবাবে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, নাম 'রিসালাতুন ফিত তাউন ওয়া জাওয়াযুল ফিরারি আনহু' (মহামারী থেকে পলায়নের বৈধতা)। এর আরেক নাম 'আল-ইবা আন মাওয়াকিইল ওবা'।

আলজেরিয়ায় ফরাসি সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াকু সৈনিক, হানাফি ফকিহ, বিচারক ও দার্শনিক হামদান বিন উসমান খাজার (১৭৭৩ – ১৮৪২ ঈ.) একটি গ্রন্থ 'ইতহাফুল মুসান্নিফিন ওয়াল উদাবা বি-মাবাহিছিল ইহতেরাযি আনিল ওবা' (মহামারী থেকে সতর্কতার আলোচনা)। এই বইতে তিনি খন্ডন করেছেন ওইসব রক্ষণশীলদের যারা কোন ধরণের পরিবর্তন মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। যারা কেবলই ভরসাকারী, যারা আল্লাহর ইচ্ছার উপর সকল বিষয়ের দায়ভার চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা ঘরে বসে ঘুমায়। যারা মহামারী ও ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে কোন ধরণের সতর্কতামূলক পদক্ষেপ ও তা থেকে বাঁচার মাধ্যম গ্রহণ করে না। গ্রন্থটির শুরুতে সে যুগের আট জন শ্রেষ্ঠ ফকিহ ও বিজ্ঞ আলেমের অভিমত যুক্ত করা হয়েছে। বইটিতে তিনি كرنتينه (Quarantine) এর প্রয়োজনীয়তা বিষয়েও নিজ মতামত ব্যক্ত করেছেন। [বিস্তারিত: মহামারী বিপর্যয়ে সচেতনতা : অষ্টাদশ শতকের হানাফি ফকিহের ব্যাখ্যা]

মধ্যযুগে মহামারীতে মুসলিম মনীষীদের চিকিৎসাবিদ্যায় ভূমিকা

আল-রাজি এবং মহামারীর বিরুদ্ধে তার গবেষণা

আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল-রাজি (৮৬৫-৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ), যিনি পশ্চিমে "রেজেস" নামে পরিচিত, ছিলেন মধ্যযুগের ইসলামী স্বর্ণযুগের অন্যতম সেরা চিকিৎসক, দার্শনিক ও বিজ্ঞানী। তাঁর অবদান বিশেষত চিকিৎসাবিজ্ঞানে এবং বিশেষভাবে মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উল্লেখযোগ্য।

মহামারীর বিরুদ্ধে আল-রাজির গবেষণা:

১. চিকিৎসাবিদ্যায় অবদান:

আল-রাজি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি গুটি বসন্ত (Smallpox) এবং হাম (Measles) রোগকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করেন। তাঁর বই **"কিতাব আল-জুদারি ওয়াল-হাসবা" (Kitab al-Judari wa al-Hasba)** এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে। বইটিতে তিনি রোগগুলির লক্ষণ, পার্থক্য এবং চিকিৎসার পদ্ধতি নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা দেন।

২. মহামারীর ব্যবস্থাপনা:

আল-রাজি মহামারীর প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর জোর দেন। তিনি রোগীদের আলাদা রাখার (Isolation) গুরুত্ব তুলে ধরেন, যা পরবর্তীকালে "Quarantine" ধারণার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

৩. গবেষণা পদ্ধতি:

তিনি পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ শনাক্তকরণ এবং চিকিৎসার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতেন। এটি ছিল আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রাথমিক রূপ।

৪. সাধারণ জনস্বাস্থ্য নির্দেশনা:

আল-রাজি তাঁর রচনায় খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম এবং পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন, যা মহামারি প্রতিরোধে সহায়ক।

৫. চিকিৎসালয় ও মহামারী নিয়ন্ত্রণ:

আল-রাজি বাগদাদের আল-মুতাওয়াক্কিল হাসপাতাল-এর প্রধান ছিলেন। সেখানে রোগীদের পর্যবেক্ষণের জন্য আলাদা ওয়ার্ড ব্যবস্থা চালু করেন, যা আধুনিক হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন

করে। মহামারীর সময় তিনি পৃথকীকরণের (quarantine) উপর জোর দিয়েছিলেন, যা রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তার প্রধান রচনা:

কিতাব আল-হাওয়ি ফি আল-তিব্ব (Kitab al-Hawi fi al-Tibb): এটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি বিশাল বিশ্বকোষ।

কিতাব আল-মানসুরি (Kitab al-Mansuri): এটি দশ খণ্ডে রচিত একটি চিকিৎসা গ্রন্থ।

কিতাব আল-জুদারি ওয়াল-হাসবা: গুটি বসন্ত এবং হাম সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ রচনা।

তার গবেষণাগুলো মধ্যযুগীয় ইউরোপে লাতিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে তার অবদান শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রভাব ফেলে। মহামারী মোকাবিলায় তার বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা-ভাবনা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগুলো আজও গুরুত্বপূর্ণ।

ইবনে সিনা এবং তার চিকিৎসাবিদ্যা

ইবনে সিনা (Ibn Sina) ছিলেন একজন প্রখ্যাত পারস্যের পন্ডিত, যিনি চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শন, বিজ্ঞান এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে অসাধারণ অবদান রেখেছেন। তাকে চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও গবেষক হিসেবে গণ্য করা হয়।

চিকিৎসাবিদ্যায় অবদান:

ইবনে সিনার চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক প্রধান গ্রন্থ হলো **"আল-কানুন ফি আল-তিব্ব" (The Canon of Medicine)**। এটি চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসে অন্যতম প্রভাবশালী গ্রন্থ এবং প্রায় ৬০০ বছর ধরে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে চিকিৎসাশাস্ত্রের মূল পাঠ্যবই হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

"আল-কানুন ফি আল-তিব্ব" এর প্রধান বৈশিষ্ট্য:

১. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি: ইবনে সিনা রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন।

২. **চিকিৎসার শ্রেণীবিভাগ:** এই বইয়ে তিনি রোগসমূহের শ্রেণীবিভাগ করেছেন এবং তাদের লক্ষণ ও চিকিৎসা পদ্ধতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

৩. **ফার্মাকোলজি (ওষুধবিদ্যা):** ইবনে সিনা বিভিন্ন গাছপালা এবং খনিজ উপাদানের ঔষধি গুণাবলী বিশ্লেষণ করেছেন।

৪. **বিজ্ঞানের সাথে সংযোগ:** শারীরবৃত্ত, শল্য চিকিৎসা, এবং মনস্তত্ত্বকে চিকিৎসাশাস্ত্রে একীভূত করেছেন।

৫. **সংক্রামক রোগ:** সংক্রামক রোগ এবং সেগুলোর বিস্তার ও প্রতিরোধ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

চিকিৎসাশাস্ত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবদান:

১. **শল্য চিকিৎসা (Surgery):** ইবনে সিনা প্রাচীন শল্য চিকিৎসার পদ্ধতিগুলোকে উন্নত করেছিলেন এবং সংক্রমণ প্রতিরোধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।

২. **পুষ্টি ও খাদ্যতত্ত্ব:** রোগীদের জন্য খাদ্যের প্রভাব সম্পর্কে বিশদ ধারণা দেন।

৩. **মনস্তত্ত্ব ও চিকিৎসা:** তিনি বিশ্বাস করতেন যে মনের ওপর শারীরিক স্বাস্থ্যের গভীর প্রভাব রয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্যচর্চার জন্য তিনি বিভিন্ন পদ্ধতি প্রস্তাব করেন।

৪. **আলাদা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা শাখা:** গাইনোকোলজি (স্ত্রীরোগবিদ্যা), চক্ষু চিকিৎসা, এবং শিশুদের চিকিৎসা বিষয়ে আলাদা অধ্যায় রচনা করেন।

ইবনে সিনার চিকিৎসা বিজ্ঞান আজও কেন গুরুত্বপূর্ণ? ইবনে সিনার কাজ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনে সহায়ক হয়েছে। তার তত্ত্ব এবং গবেষণা আজও ইতিহাসবিদ এবং

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস। মধ্যযুগে তার কাজ ইউরোপে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল এবং পশ্চিমা চিকিৎসাবিদ্যার ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।

ইবনে সিনা বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, যার চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও দর্শনের ওপর অবদান আজও তাকে স্মরণীয় করে রেখেছে। তার গবেষণা এবং গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে তিনি জ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন, যা চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নয়নে অমূল্য।

বর্তমান যুগে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারীতে আলেম-ওলামাদের ভূমিকা এবং অবদান।

২০২০ সালে করোনার প্রকোপে যখন সারাবিশ্ব থমকে দাঁড়ালো, কলকারখানা, অফিসসহ সকল কর্মসংস্থান বন্ধ হয়ে গেলো, বাংলাদেশে তখন সবচেয়ে কঠিন সময় পাড় করছিলেন নিম্ন আয়ের মানুষেরা। অপরদিকে কোভিড–১৯ কে একটি সংক্রামক ভাইরাস হিসেবে ঘোষণা করায় মানবতাও যেন হারিয়ে গেয়েছিল অচিনপুরে! সংক্রমিত হওয়ার ভয়ে অসুস্থ স্বামীকে ছেড়ে স্ত্রীর বাপের বাড়ি চলে যাওয়া, বৃদ্ধ মাকে রাস্তায় ফেলে সন্তানদের পালিয়ে যাওয়ার মতো নির্মম ঘটনাগুলো ঘটতে ছিল। কোনো মানুষ মারা গেলে তার দাফন-কাফন তো দূরের কথা একান্ত স্বজনেরাও তার লাশ ছেড়ে পালাতে মরিয়া ছিল। ঠিক মানবতার এই চরম সংকটকালে ভাগ্যাহত জীবিত ও মৃত মানুষের পাশে উদার মানবতা ও বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে যারা দাঁড়িয়েছিলেন, তারা হলেন এদেশের আলেম সমাজ, আপামর ধর্মীয় সমাজ।

লকডাউনের সময়টাতে সবার মত আলেমদের কর্মসংস্থানও বন্ধ থাকায় তারাও অনেক সংকটে ছিলেন। কিন্তু এই সংকট আর্ত মানবতার পাশে দাঁড়াতে তাদের বাঁধা হতে পারেনি। নিজের যতটুকু আছে তা নিয়েই এগিয়ে গিয়েছিলেন আরেক ভাইয়ের সাহায্যে। মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন স্বজনদের ফেলে রাখা লাশের কাফন-দাফনে।

২০২২ সালের সীতাকুণ্ড দূর্ঘটনা ও সিলেটের ভয়াবহ বন্যায়ও বরাবরের মতোই এগিয়ে ছিলেন আলেম সমাজ। সীতাকুণ্ডের কন্টেইনার ডিপো বিস্ফোরণে আহত-নিহতদের উদ্ধারকার্যের সহযোগিতায় সবচেয়ে তৎপর দেখা গেছে আলেমদের।

দেশের সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ও কুড়িগ্রামে আকস্মিক ও ভয়াবহ বন্যা দেখা দিলে বন্যার্ত মানুষের জন্য যারা কাজ করেছে তাদের ভেতর আলেমসমাজের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।

সংকটের প্রথম দিন থেকে তারা মাঠে থেকে কাজ করছেন। এখন অবধি কাজ করে যাচ্ছেন। এখানে সে সময়ে প্রকাশিত কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের রিপোর্ট অনুসারে আলেমদের পরিচালিত ও নেতৃত্বাধীন কিছু সংগঠন ও সংস্থার ত্রাণ তৎপরতা তুলে ধরা হলো—

আস-সুন্নাহ ট্রাস্টঃ গত ২৪ জুন পর্যন্ত সুনামগঞ্জে প্রায় ১০০ টন ত্রাণ পাঠিয়েছেন শায়খ আহমাদুল্লাহ। তিনি নিজে সুনামগঞ্জের দুর্গম হাওর অঞ্চলে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। তাদের ক্রয়কৃত ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল, ডাল, লবণ, সয়াবিন তেল, খেজুর, হলুদ-মরিচের প্যাকেট, চিড়া, শিশুখাদ্য, ছাতু, ওষুধ ইত্যাদি। সুনামগঞ্জ ছাড়াও তিনি সিলেট সহ বন্যা কবলিত অন্যান্য অঞ্চলেও ত্রাণ পাঠিয়েছেন। এবারের কুরবানির ঈদে 'সবার জন্য কুরবানী' শিরোনামে দেশব্যাপী ১০০ গরু ও শতাধিক ছাগল কুরবানি করে দরিদ্রদের মাঝে গোশত বিতরণ করেছেন।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নানা বিপর্যয়ে জনসেবা করে এরই মধ্যে সাধারণ মানুষ ও গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। সিলেট বিভাগে বন্যা শুরু হওয়ার একদম শুরু থেকে বানভাসি মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে তারা। মূল দলের কেন্দ্রীয় কমিটির তত্ত্বাবধানে একযোগে কাজ করেছে দলটির ছাত্র ও যুব সংগঠনসহ সব সহযোগী ও অঙ্গসংগঠন। গত ২৪ জুন দৈনিক কালের কণ্ঠ ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমানের দেওয়া সাক্ষাৎকার থেকে আমরা জানতে পারি, তিনি বলেন, 'দলের আমির ও নায়েবে আমিরের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় আমরা প্রথম দিন থেকে কাজ করছি। দলের আমির সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম গত ২১ জুন নিজে ত্রাণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিলেন।'

তিনি আরো বলেন, 'কাজের ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। কেননা এসব অঞ্চলে সহজে ত্রাণ পৌঁছায় না। আমাদের সহায়তার মধ্যে শুকনা ও প্রস্তুত উভয় প্রকার খাবার আছে। ত্রাণসামগ্রী প্রক্রিয়াজাত করতে আমরা সিলেট শহরে দুটি এবং সুনামগঞ্জে একটি পয়েন্ট নির্ধারণ করেছি। বন্যার পানি যেসব এলাকায় নেমে গেছে সেখানে আমরা পুনর্বাসনে সহযোগিতা করছি। মানুষের ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণ, বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজে সাহায্য করছি। বন্যা ও বন্যা-পরবর্তী সময়ে রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। তাই আমরা একটি মেডিক্যাল টিমও গঠন করেছি, যারা বন্যাদুর্গত এলাকায় চিকিৎসাসেবা দেবে।' সিলেট সুনামগঞ্জের বাইরে নেত্রকোনা, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রামেও ইসলামী আন্দোলন ত্রাণ তৎপরতা চালাচ্ছে বলে জানান মাওলানা গাজী আতাউর রহমান।

পিসবঃ বন্যাদুর্গত এলাকায় পিপলস্ ইমপ্রুভমেন্ট সোসাইটি অব বাংলাদেশ (পিসব) ১৯ মে ২০২২ থেকে ধারাবাহিক কাজ করে যাচ্ছে। সিলেট ও সুনামগঞ্জে এখন পর্যন্ত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সাত হাজার পাঁচ শ পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী ও ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া সিলেট ও সুনামগঞ্জের দুই শতাধিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে মাছ ধরার বিভিন্ন ধরনের জাল, হাঁড়িপাতিল, টিন এবং দুই হাজার মানুষের মাঝে পুষ্টিকর প্রস্তুত খাবার বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া কুড়িগ্রাম, জামালপুর, কিশোরগঞ্জে এক হাজার ৫০০ পরিবারকে ১৬ কেজি করে খাদ্য ও ওষুধ বিতরণ কার্যক্রম চলছে। বন্যা-পরবর্তী স্যানিটেশন, টিউবওয়েল, গৃহ সংস্কার, নৌকা, জাল বিতরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। ওই প্রকল্প পরিচালনা করছেন মাওলানা ইমরান হুসাইন হাবিবী ও তাঁর সঙ্গীরা।

খেলাফত মজলিসঃ সিলেট ও সুনামগঞ্জ অঞ্চলে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ হাজার পরিবারের কাছে সহায়তা পৌঁছানোর চেষ্টা করেছে খেলাফত মজলিস। বানভাসি মানুষকে সহযোগিতা করতে সিলেট জেলা ছাত্র মজলিসের পাঁচটি স্বেচ্ছাসেবক দল ও জেলা খেলাফত মজলিসের ১০টি স্বেচ্ছাসেবক দল একযোগে কাজ করেছে। তাদের সহযোগিতার মধ্যে আছে শুকনা ও প্রস্তুত করা খাবার। সিলেট বিভাগের বাইরে কুড়িগ্রামেও একটি কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দল কাজ করেছে। দলের কেন্দ্রীয় সহপ্রচার সম্পাদক প্রকৌশলী আবদুল হাফিজ খসরু জানান, খেলাফত মজলিস কেন্দ্রীয়ভাবে ফান্ড সংগ্রহ করলেও তাদের দলের সিলেট জেলা শাখার নিজস্ব বাজেট এক কোটি টাকা। বন্যার পানি নেমে গেলে তাদের পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হবে।

জামায়াতে ইসলামীঃ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীও বন্যার্ত মানুষদের সহযোগিতায় উদারভাবে হস্তপ্রসার করেছে। তারা বড় অংকের বাজেট নিয়ে বিপর্যস্ত অঞ্চলগুলোতে ত্রাণ বিতরণ করেছেন ও করে আসছেন। সিলেটে বন্যাগ্রস্ত লোকদের মাঝে উপস্থিত হয়ে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান নিজে ত্রাণ বিতরণ করেছেন। এ ছাড়া কুড়িগ্রাম সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের ত্রাণ কার্যক্রম চালু রয়েছে।

সিয়ানাহ ট্রাস্টঃ একটি গবেষণাধর্মী ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠন হলেও জনসেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে সিলেটের সিয়ানাহ ট্রাস্ট। সিলেট বিভাগে যখন প্রথম ধাপে বন্যা শুরু হয়, তখন থেকেই বন্যার্ত মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে বলেন জানান ট্রাস্টের পরিচালক মুফতি জিয়াউর রহমান। তিনি জানান, প্রথম ধাপের বন্যায় খাদ্য বিতরণ ও পুনর্বাসনে জন্য ১০

লাখ টাকা বিতরণ করেছিল সিয়ানাহ ট্রাস্ট। দ্বিতীয় ধাপে বন্যা শুরু হওয়ার পর এখন পর্যন্ত ১০ লাখ টাকার খাদ্যসামগ্রী, প্রস্তুত ও শুকনা খাবার বিতরণ করেছে তারা। বন্যা-পরবর্তী সময়ে পুনর্বাসন নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা আছে তাদের। পুনর্বাসন প্রকল্পের জন্য সিয়ানাহ ট্রাস্ট্রের লক্ষ্যমাত্রা ৫০ লাখ টাকা।

সৃজন ঘরঃ সিলেটের তরুণ আলেমদের সংগঠন 'সৃজন ঘর'ও বন্যার্ত মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত তারা শতাধিক পরিবারকে নগদ অর্থ দান, কয়েক হাজার পরিবারের মধ্যে খাবার ও বিশুদ্ধ খাবার পানি বিতরণ করেছে। তরুণ এই আলেমরা শুধু নিজেরাই সহযোগিতা করছেন এমন না, বরং বানভাসি মানুষের জন্য কাজ করছে এমন একাধিক সংগঠন ও সংস্থার সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সহযোগিতাও করছেন।

দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসা থেকেও ১১টি নৌকাসহ বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী পাঠানো হয়েছে বন্যাগ্রস্ত সিলেটে। এ ছাড়া হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত বাংলাদেশ, আল মুঈন ত্রাণ তহবিল, আল মানাহিল ফাউন্ডেশন, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিস, হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) সেবা সংস্থা, বাংলাদেশ ইসলামী লেখক ফোরাম, (পুরান ঢাকার) ইমাম পরিষদ, ইকরামুল মুসলিমিন ফাউন্ডেশন, সাবআ সানাবিল, তাসমিয়া ট্রাস্ট, বাসমাহ ট্রাস্ট, আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ, বারাকাহ ইত্যাদি সংগঠন ও সংস্থা বানভাসি মানুষের জন্য কাজ করছে। সাংগঠনিক কাঠামোর বাইরেও বহু আলেম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মসজিদ কর্তৃপক্ষ বন্যার্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন সাধ্যের সবটুকু নিয়ে। এদেশের আলেম ও ধর্মীয় সমাজের এই ত্যাগ, স্বেচ্ছাসেবা ও স্বেচ্ছাশ্রম মানবতার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে জ্বলজ্বল করবে। আগামী প্রজন্ম এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে। মানবতার সেবায় নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিয়োগ করবে ইন-শা-আল্লাহ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারী: আমাদের জন্য শিক্ষা

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্যোগ ও মহামারী আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি এবং তাঁর পক্ষ থেকে পরীক্ষার একটি মাধ্যম। এ ধরনের ঘটনা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্ব, মানুষের দায়িত্ববোধ, এবং আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের শিক্ষা দেয়। কুরআন ও হাদিসে দুর্যোগ ও মহামারী নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষা ও নির্দেশনা রয়েছে।

দুর্যোগ ও মহামারীঃ পরীক্ষা ও শিক্ষা

১. পরীক্ষা ও শুদ্ধিঃ

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۙ

"আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।"
— (সূরা আল-বাকারা: ১৫৫)

মহামারী বা দুর্যোগ মানুষের ধৈর্য, ঈমান ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের পরীক্ষা।

২. তাওবার সুযোগঃ

দুর্যোগ মানুষকে নিজের পাপের দিকে মনোযোগ দিতে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসার সুযোগ দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰي دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

"আর অবশ্যই আমি তাদেরকে গুরুতর আযাবের পূর্বে লঘু আযাব আস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে।"
— (সূরা আস-সিজদাহ: ২১)

মহামারী ও ইসলামের নির্দেশনা

১. সতর্কতা ও সাবধানতাঃ

হাদিসে মহামারীর সময় একটি স্থানে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং সে স্থান থেকে বের হতেও নিষেধ করা হয়েছে:

"যেখানে প্লেগ (মহামারী) ছড়িয়ে পড়েছে সেখানে প্রবেশ করো না এবং যদি তোমার অবস্থানস্থলে তা ছড়িয়ে পড়ে তবে সেখান থেকে বের হয়ো না।"
— (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫৭২৮)

২. **স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাঃ**
ইসলামে পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। হাদিসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

"পরিচ্ছন্নতা হলো ঈমানের অর্ধেক।"
— (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২২৩)

দুর্যোগের সময় করণীয়
১. **ইস্তিগফার ও তাওবাঃ**
পাপ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তাওবা করা।

২. **দু'আ ও ইবাদাতঃ**
রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কঠিন সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন এবং তাঁর ওপর ভরসা রাখতেন।

৩. **সাদাকা ও মানবসেবাঃ**
সমাজের অসহায় ও বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো ইসলামি নৈতিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৪. **ধৈর্য্য ও আল্লাহর প্রতি আস্থাঃ**
দুর্যোগের সময় ধৈর্যধারণ এবং আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখা ইসলামের একটি মূল শিক্ষা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

"মুমিনের বিষয়টি আশ্চর্যজনক। তার সবকিছুই কল্যাণকর। যদি তাকে আনন্দিত কিছু দেওয়া হয়, সে শুকরিয়া আদায় করে, আর তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি বিপদে পড়ে, সে ধৈর্য ধারণ করে, আর তাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।"
— (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৯৯৯)

সুতরাং, দুর্যোগ ও মহামারী ইসলামে মানুষের জন্য একটি পরীক্ষা এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যম। এগুলো আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন এবং মানবতার সেবায় উৎসাহিত করে।

শেষকথা

যুগে যুগে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারীর আগমন ঘটেছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু মানুষ ও প্রাণী। বিশেষ করে উমাইয়া শাসনামলে প্রতি সাড়ে চার বছর পর পর মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। ফলে শাসকেরা অনেক সময় শহুরে জীবন পরিত্যাগ করে মরুভূমির জীবন বেছে নিয়েছিলেন। এতেও শেষ রক্ষা হয়নি। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্বর্ণযুগেও করোনা মহামারী স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, আমল সংশোধনের মাধ্যমে নিজেকে পরিশুদ্ধ করা ও তাওবা করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পানে ফিরে আসার বিকল্প কিছু নেই। কারণ আজ সারা বিশ্বের সকল পরাশক্তি একটি অদৃশ্য ভাইরাসের কাছে অসহায়। সভ্যতাগর্বীদের সকল অহংকার ও দাম্ভিকতা আজ ধূলোয় মিশে গিয়েছে। বিজ্ঞানের সব আবিষ্কার যেন আজ অকেজো হয়ে যাচ্ছে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক অদৃশ্য ভাইরাসের কাছে হার মেনেছে সকলে। অতএব আর অহংকার নয়। দুর্বলের উপর সবলের যুলুম-নির্যাতন নয়। শোষণ-বঞ্চনা নয়। আত্ম সংশোধনের এখনই উপযুক্ত সময়। আল্লাহ আমাদের সকলকে নিজেদের আমল সংশোধন ও তাওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট ফিরে আসার তাওফীক দান করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র

[১] হাফেয ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৭/৯০-৯৬; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৩/১৭৪; ফাৎহুল বারী ৭/৯৯; ইবনু সা'দ, আত-তাবাক্বাতুল কুবরা ৭/৩৯৯।

[২] ছহীহুত তারগীব হা/১৪০৮; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৩৮৬৯।

[৩] মুসনাদে আহমাদ হা/১৯৫৪৬; ছহীহুল জামে' হা/৪২৩১; ছহীহুত তারগীব হা/১৪০৩, সনদ ছহীহ।

[৪] মুসনাদে আহমদ হা/১৫৬৪৬; ছহীহুত তারগীব হা/১৪০৫।

[৫] বাক্বারাহ ২/৫৯; তাফসীরে তাবারী হা/১০৪০, ২/১১৭।

[৬]বুখারী হা/৩৪৭৩; মুসলিম হা/২২১৮; মিশকাত হা/১৫৪৮।

[৭] মোল্লা আলী কারী, মিরক্বাত ৩/১১৩৩, হা/১৫৪৮-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

[৮] তারীখে দিমাশ্ক ৫৮/৩৩৬।

[৯] নববী, শরহ মুসলিম ১/১০৬।

[১০] https://at-tahreek.com/

[১১] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া

[১২] https://fateh24.com/

[১৩] ছোঁয়াচে রোগ নিয়ে দ্বিমুখী বিতর্ক: মুশফিকুর রহমান মিনার